দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 04 JAN 2014 ...
পৃষ্ঠা ...১০... কলাম ...৮...

# বইপড়া কি হারিয়ে যাচ্ছে?

- স্কুলের লাইব্রেরী এখন বন্ধই থাকে
- প্রযুক্তিগত আয়োজনে টিভি, ইন্টারনেট, মোবাইল ফোন ইত্যাদির চাপে কি বইপড়া উধাও?
- প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের তোলপাড়ে আমরা কি বিভ্রান্ত?

■ আসিফুর রহমান সাগর

বইপড়ার অভ্যাস কি আমাদের জীবন থেকে হারিয়ে যাচ্ছে? প্রযুক্তির দিগন্তবিস্তারী আলোড়নে কি বই নিয়ে ঘরের কোনে বসার সময় হারিয়ে ফেলছি আমরা? গত দুই দশকে নবীন লেখক নতুন চিন্তা বা নতুন কোন গল্প ও-কবিতা নিয়ে আমাদের মনের দরজায় করাঘাত করেন। এই অস্থির অবস্থার কারণটাই বা কী?

স্কুলগুলোর লাইব্রেরি থেকে এই তো তিন দশক আগেও শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার পাশাপাশি গল্পের বই ও নানা রকম বই দেয়া হতো। শুধু পাঠ্য বই নয়, এর বাইরেও পড়ার অনেক কিছু রয়েছে এবং একজন মানুষের বেড়ে উঠবার জন্য যে বাইরের বই বেশি করে পড়া দরকার এটা তখন সবাই মানতেন। কিন্তু এখন স্কুলের লাইব্রেরিগুলো বন্ধই থাকে।

অথচ সভ্যতার সূচনায় মানুষ যখন জ্ঞানের চর্চা শুরু করেছে তখন থেকেই বইয়ের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছে। মানুষের লব্ধ ও গবেষণালব্ধ জ্ঞানকে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য বাঁচিয়ে রাখার প্রয়োনীয়তা থেকেই লাইব্রেরির সৃষ্টি। বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন লাইব্রেরি 'লাইব্রেরি অব আলেকজান্দ্রিয়া' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল খ্রিষ্টপূর্ব ২৮৮ অব্দে। সম্রাট আলেকজান্ডারের সময়ে টলেমি-১, ফেলেরনের দিমিত্রিয়াসের তত্ত্বাবধানে প্রতিষ্ঠা করেন এ লাইব্রেরি। এরপর ধ্বংসে হওয়ার আগে পর্যন্ত প্রায় ৬০০ বছরের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সকল শাখার সকল আবিষ্কার ও দলিলের সাক্ষী হয়ে ছিল এই লাইব্রেরি। বর্তমানে বিশ্বে সবচেয়ে বড় লাইব্রেরি লন্ডনে অবস্থিত 'ব্রিটিশ মিউজিয়াম

পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

## বইপড়া কি হারিয়ে যাচ্ছে

২০ পৃষ্ঠার পর

লাইব্রেরি'। যার বইয়ের সংখ্যা প্রায় এক কোটি ৭০ লাখ। প্রতিবছর ১ কোটি ৭৫ লাখ আগ্রহী পাঠক এই লাইব্রেরিতে আসেন। দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসিতে অবস্থিত লাইব্রেরি অব কংগ্রেস্। যার বই সংখ্যা প্রায় ১ কোটি ৩১ লাখ। আর প্রতিবছর ১ কোটি ৭৫ লাখ পাঠক এই লাইব্রেরিতে আসেন।

শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশেও লাইব্রেরির প্রসার হতে থাকে। বাংলাদেশের শহর ও পল্লীতে রাজা-জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতায় ও ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে লাইব্রেরি। যা পরবর্তী প্রজন্মের পর প্রজন্মকে জ্ঞানের আলো ছড়িয়েছে। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের লাইব্রেরিগুলো যেন দ্যুতিহীন, ম্রিয়মাণ। বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রের বইপড়া কর্মসূচির অংশ হিসাবে বইয়ের গাড়ি পাড়া-মহল্লায় গিয়ে পাঠকের দরজায় বই পড়ার জন্য কড়া নাড়ছে। কিন্তু সে রকম উৎসাহ যেন তাতে নেই।

অন্যদিকে নতুন কোন লেখকও উঠে আসতে দেখা যায়নি গত দুই দশকে। যিনি তার লেখা দিয়ে পাঠককে আকৃষ্ট করবেন। ষাট, সত্তর এবং আশির দশকের পরে সৃজনশীল ও মননশীল লেখার জগতে নতুন লেখক খুব কমই উঠে এসেছেন। একজন লেখককে তুলে ধরার দায়িত্ব একজন প্রকাশকেরও। কিন্তু সেটা হচ্ছে না। এর কারণ হিসাবে অনেকে বলছেন, আগে প্রকাশকরাও পাঠক সমাজের অংশ ছিলেন। তারা ভালো লেখা বুঝতেন, লেখকদের সঙ্গে বই প্রকাশের বাইরেও প্রকাশকদের সম্পর্ক ছিল। ফলে কোন লেখক কেমন চিন্তা করছেন এটা তারা বুঝতে পারতেন। বই নিয়ে, লেখা নিয়ে আড্ডা হতো। এসব আড্ডায় তারাই আসার সাহস করতেন যাদের পড়াশোনা রয়েছে। সেসব আড্ডার মধ্য দিয়ে নতুন সম্ভাবনাময় লেখক উঠে এসেছেন। একই বিষয়ে অনেকে কথা বলছেন, কিন্তু সেই বিষয়টিকে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখছেন কে! এসব বিষয় বোঝা যেত সেসব আড্ডায়। আশির দশকের পর সেসব আড্ডা প্রায় উঠেই গেছে। প্রকাশকরাও ভালো লেখক খুঁজে বের করার চাইতে ব্যবসার দিকে নজর দিচ্ছেন বেশি।

প্রতিবছরই বাংলা একাডেমি আয়োজিত 'অমর একুশে গ্রন্থমেলায়' মানুষের ভিড় বাড়ছে। বাড়ছে বই বিক্রির পরিমাণ। প্রতিবছরই রেকর্ড পরিমাণ বই প্রকাশিত হচ্ছে। পুরো ফেব্রুয়ারি মাস সারাদেশের মানুষ বইমেলায় প্রকাশিত বইয়ের দিকে তাকিয়ে থাকেন। ঢাকার বাইরে থেকে, বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বাঙালিরা এসে জড়ো হন বইমেলার টানে। এটা নিঃসন্দেহে খুবই ইতিবাচক দিক। কিন্তু বিস্ময়কর হচ্ছে বইমেলার পরে সারাবছর দেশে আর কোন নতুন বই প্রকাশিত হতে দেখা যায় না। প্রকাশকরাও কোন ভালো পাণ্ডুলিপি পেলে তা প্রকাশ করেন না। জমিয়ে রাখেন বইমেলায় প্রকাশের আশায়।

এ প্রসঙ্গে 'আগামী প্রকাশনী'র স্বত্বাধিকারী ওসমান গণি বলেন, ভালো বই আসছে না। ভালো লেখকের অভাবেই ভালো বই নেই। বইমেলাতে হাজার হাজার বই প্রকাশিত হয়, কিন্তু উল্লেখ করার মত একটি ভালো বই পাওয়া খুব মুশকিল। প্রতিবছর মেলাতে প্রায় চার হাজার গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। আর সারাবছর সব প্রকাশনী মিলিয়ে চারশ' বইও প্রকাশিত হয় না। অন্যসময়ে বই প্রকাশ করলেও তা বিক্রি হয় না। ফলে বলা যায় যে, আমাদের পাঠকও বইমেলাকেন্দ্রিক। অন্যসময় পাঠকেরও বইয়ের প্রতি খুব একটা আগ্রহ নেই।

পুস্তক প্রকাশনা সংস্থা ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেডের (ইউপিএল) ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহিউদ্দিন আহমেদ বলেন, পাঠকের চাহিদা ভালো বই। আর ভালো বইয়ের জন্য ভালো লেখক প্রয়োজন। ভালো লেখক তারাই যারা বাংলা সাহিত্যকে উঁচুমানে নিয়ে যাবে। বাংলা ভাষার পাঠক শুধু বাংলাদেশে নেই। ভারতসহ সারাবিশ্বে ছড়িয়ে রয়েছে। সেই পাঠক বিশ্বসাহিত্যের স্বাদ পাচ্ছেন। তাদের কাছে মাতৃভাষার সাহিত্যকে মানের প্রমাণ রাখতে হবে। কিন্তু সে খুব একটা দেখা যাচ্ছে না।

প্রফেসর ইমেরিটাস আনিসুজ্জামান বললেন, পাঠক কমছে কিনা এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট জরিপ নেই। এমনও হতে পারে প্রযুক্তির চাপে; টিভি, মোবাইল, ইন্টারনেট প্রভৃতির ব্যবহারের কারণে মানুষের বইপড়ার প্রতি আগ্রহ কমছে। অন্যদিকে, প্রতিবছর বইমেলায় তো বই বিক্রি বাড়ছে। ফলে সুনির্দিষ্ট করে কিছু বলা যাচ্ছে না। আরেকটি দিক হচ্ছে, গত বিশ বছরে নতুন কোন লেখককে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে দেখা যায়নি। পাঠকের লেখককে খুঁজে বের করার দায়িত্ব রয়েছে বলে অনেকে বলেন। তবে আমার মনে হয়, এই মাথাচাড়া দিয়ে সবার নজরে পড়ার বিষয়টা লেখককেই ঘটাতে হয়। নতুন লেখক উঠে আসার এটাই ধরন।

কথা সাহিত্যিক সেলিনা হোসেন বলেন, সাধারণ দৃষ্টিতে মনে হয়, বই পড়ার অভ্যাসটা কমে গেছে। এটা সত্যি। প্রযুক্তির প্রভাব তরুণ প্রজন্মের মধ্যে প্রবল। গুগল সার্চ করলে বিশ্বকে হাতের মুঠোয় পাচ্ছে তারা। কিন্তু বই একটি ভিন্নমাত্রার জিনিস। এর মাঝে আনন্দ, শিক্ষা, জীবনকে গড়ে তোলার স্বপ্নময় জগৎ আছে। তাই তরুণ ও শিশুদের বইমুখী করতেই হবে। এ জন্য আমি দুটি বিষয়কে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেই। ১. অভিভাবক ও পরিবারের দায়িত্বঃ টিভি দেখা ও ইন্টারনেট ব্রাউজ করার পাশাপাশি শিশুদের যাতে বই পড়ার অভ্যাস গড়ে ওঠে সে জন্য হাতের কাছে তার পছন্দের বইগুলোকে স্থান দিতে হবে। ২. স্কুল কর্তৃপক্ষের দায়িত্বঃ স্কুল লাইব্রেরি থেকে বই দেয়া ও সেসব বই নিয়ে বিতর্ক অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হবে। এর মধ্য দিয়ে একটি শিশু মানবিক, যুক্তিবোধসম্পন্ন সচেতন মানুষ হিসাবে বেড়ে উঠবে। অন্যদিকে, লেখকদেরও বাংলা সাহিত্যের ধারাবাহিকতাকে ধারণ করে চর্চা করে যেতে হবে। কারণ লেখকদের অবলম্বন করেই তো শিশু ও তরুণদের বিকাশ ঘটবে।

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ২০১২ সালে ঢাকায় 'দৈনিক ইত্তেফাক'কে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রভাব ও অভিগমন মানুষের মাঝে খুব দ্রুত পড়ে। মানুষও প্রযুক্তির সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে এগিয়ে যায়। এই পারস্পরিক প্রভাব খুব গভীর। এই প্রভাবটা ভাষার ওপর এসেও পড়ে। পৃথিবীর পরিবর্তন খুব দ্রুত ঘটছে। আমাদের ছোটবেলায় এ পরিবর্তন হতো ধীরে। হারিকেন থেকে বিজলী বাতির পর্যায়ে পৌঁছতে অনেক সময় লেগেছে। রেডিও এসেছে সেখান থেকে টেলিভিশনের আবির্ভাবেও সময় লেগেছে অনেক। এখন এটা খুব দ্রুত ঘটছে। মানুষ এই পরিবর্তনকে নানাভাবে দেখছে। তোলপাড়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে মানুষ। ফলে বই পড়ার দিকে এখন আগ্রহ খানিকটা কম বলেই মনে হয়। এই প্রযুক্তির প্রভাব যেমন পাঠককে আলোড়িত করছে তেমনি একজন লেখকের সামনেও নতুন চ্যালেঞ্জ নিয়ে দাঁড়াচ্ছে। একজন লেখক যত দ্রুত এই পরিবর্তনকে উপলব্ধি করতে পারবেন, পরিবর্তনকে বুঝে নিয়ে লিখতে পারবেন ততই সক্রিয় থাকবেন।